প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রদত্ত গবেষণা পত্রের

<u>৫০০০ শব্দের সারাৎসার</u>

গবেষণার বিষয়

বাংলা ছোটগল্পে উদ্বাস্তু সমস্যা : রূপ ও রূপান্তর (১৯৪৭ - ২০০০)

গবেষক

দেবাশিস মণ্ডল

বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

রেজিস্ট্রেশন নং : R-14RS02120042

রেজিস্ট্রেশন তারিখ : ১০ই মে, ২০১৬

গবেষণা নির্দেশক

ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

৮৬/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০৭৩

সূ চি প ত্র

প্রস্তাবনা : ৩-৫

প্রথম অধ্যায়: ৫-৮

ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও উদ্বাস্তু সমস্যা

দ্বিতীয় অধ্যায়: ৮-১০

সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও উদ্বাস্তু সমস্যা

তৃতীয় অধ্যায় : ১০-১২

সাংস্কৃতিক-ভাষাগত পরিবর্তন: উদ্বাস্তুর আত্মসংকট ও বাংলা ছোটগল্প

চতুর্থ অধ্যায়: ১২-১৩

উদ্বাস্তু জীবনের গল্পে বাঙালির রূপ ও রূপান্তর

পঞ্চম অধ্যায় : ১৩-১৪

উদ্বাস্তু সমস্যার রূপ ও রূপান্তর: বাংলা ছোটগল্প ও অন্যান্য সাহিত্য প্রকরণ

ষষ্ঠ অধ্যায় : ১৪-১৫

উদ্বাস্তু জীবনের গল্প: প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল

উপসংহার : ১৫-১৭

সহায়ক গ্রন্থসমূহ : ১৮-২৬

বাংলা ছোটগল্পে উদ্বাস্তু সমস্যা: রূপ ও রূপান্তর (১৯৪৭-২০০০)

৫০০০ শব্দের সারাৎসার

প্রস্তাবনা

বাংলা ছোটগল্পে 'উদ্বাস্তু' সমস্যার কথা বলতে গেলেই 'উদ্বাস্তু' বলতে আমরা ঠিক কাদের বুঝি এবিষয়ে একটি পরিচ্ছন্ন আলোচনা করা জরুরি হয়ে ওঠে। একজন মানুষ যে অনিচ্ছার পরেও তার চেনা-পরিচিত ঘরবাড়ি তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া পরিবেশ ছেড়ে অন্যত্র বা অন্যদেশে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে বা নিজেকে বাঁচাতে ছুটে যায়, সেই মানুষ বা মানুষদেরই আমরা উদ্বাস্তু বলে থাকি। উদ্বাস্তু মানুষ যে শুধুমাত্র অনিচ্ছার খাতিরে দেশ, তার পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় সব সময় এমনটাও নয়, আবার এমনও দেখা যায় বেশ কিছু মানুষ অনটন কিম্বা জীবন-জীবিকার তাগিদে অন্যত্র বা অন্যদেশে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। তাদেরকেও কিন্তু আমরা সংকীর্ণ অর্থে উদ্বাস্তু বলে থাকি। কিন্তু রাজনৈতিক বা সামাজিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ঘটে যাওয়া সাধারণ যে উদ্বাস্তু তার সাথে আর্থিকভাবে ধসে পড়া উদ্বাস্তু মানুষের একটা সূক্ষ্ম ফারাক আছে অর্থাৎ যে অর্থের কারণে বা তার জীবন-জীবিকার তাগিদে নিজ ঘর ছাড়ছে বা নিজ ঘর ছেড়ে অন্যত্র জীবন-জীবিকার জন্য গমন করছে, তাকে ঠিক আমরা সেই অর্থে উদ্বাস্তু বলতে পারি না অর্থাৎ সোজা কথায় অনিচ্ছার পরেও ঘরছাড়া মানুষই হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত উদ্বাস্তু। বিভিন্ন অভিধানে উদ্বাস্তু শব্দের যে সব অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে সে বিষয়েও জানা দরকার। আভিধানিক অর্থে উদ্বাস্তু শব্দটার মানে হতে পারে বাস্তুহীন, ভিটাচ্যুত, বাস্তুভিটা ত্যক্ত, গৃহত্যাগে বাধ্য বা বাস্তুভিটা থেকে দূরীভূত। উদ্বাস্তু সম্পর্কিত এরকম কিছু আভিধানিক শব্দ প্রচলিত আছে। তবে কি কারণে ঠিক মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটে সে বিষয়ে নিম্নে দু'একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ'ল-

1. "One Who, owing to religious persecution or political troubles, seeks refuge in a foreign country" [১]

2. "Person who has been forced to Flee from danger, e.g. from floods, war, political persecution" [২]

3. "A person who Flees for refuge or safety, esp. to a foreign country, as in time of war" [৩]

কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ওঠে বা মানুষের উদ্বাস্তু হবার কারণ নিয়ে এরকম বেশ কিছু তথ্য পেলেও '*ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি*' (ইউ.এন.এইচ.সি.আর) উদ্বাস্তুর যে সংজ্ঞা দান করেছেন সেটাই সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য ও উৎকৃষ্ট। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানুষ কেন ও কোন পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু হয় তা স্পষ্ট-

“A refugee, according to the 1951 statute of the office of the United Nations High-commissioner on Refugee (UNHCR), IS ANY PERSON WHO, owing to well-funded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group of political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, in unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having of nationality and being outside the country of his former habitual residence, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it”[৪]

উদ্বাস্তু মানুষের ঘর ছাড়ার কাহিনি বহুকাল আগে থেকেই ঘটে চলেছে আজ একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষেও তা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। আজও সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে দৈনিক বিভিন্ন সংবাদপত্রে চোখ বোলালেই সন্ধান পাওয়া যায় উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার ও কাতর কান্নায় তাদের ঘর হারানোর কথা। কানে ভেসে আসে তাদের আর্তনাদ। আমরা বাঙালিরা যতই ‘উদ্বাস্তু’ শব্দটা শুনি না কেন আমাদের কাছে ‘শরণার্থী’ বা ‘উদ্বাস্তু’ শব্দগুলি থেকে ‘রিফিউজি’ শব্দটি অনেক বেশি তাচ্ছিল্যের মনে হয়, এ বিষয়ে অবশ্য দ্বিমতও থাকতে পারে। ভারতবর্ষে ’৪৭-এর দেশভাগের পর বা তারও আগে থেকে এই উদ্বাস্তু সমস্যা হ্রাস পাওয়াতো দূরের কথা উপরন্তু বেড়েই চলেছে। তামাম দুনিয়া এই সমস্যায় জর্জরিত। আজকের দিনে সিরিয়ান বা রোহিঙ্গাদের সমস্যা তারই নামান্তর (এই সিরিয়ান উদ্বাস্তু বা রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে)। উদ্বাস্তু মানুষের কথা বলতে গেলেই মনে পড়ে যায় ওপার বাংলার উদ্বাস্তু অসহায় মানুষের কথা। তবে ভারত অতিক্রম করে বর্তমানে এই সমস্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রকট হয়ে উঠেছে। একারণেই উদ্বাস্তু সমস্যা নিজস্ব দেশ-গণ্ডি পেরিয়ে পরিণত হয়েছে মস্ত এক আন্তর্জাতিক সমস্যায়। বঙ্কিমের ‘কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬) উপন্যাসে নায়িকা কপালকুণ্ডলা বলেছিল-‘পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ’- এ প্রশ্নের সঠিক জবাব কিন্তু দিতে পারেনি নবকুমার। সেই থেকে দেড়শো বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত আজও পরিসংখ্যান মাফিক “পৃথিবীর প্রতি ১১৩ জন লোকের ১ জন সত্যিই করে পথ হারিয়েছে।”[৫] তারা উদ্বাস্তু মানুষ। নবকুমারের মত এই উদ্বাস্তু মানুষেরা শুধু পথ হারায়নি, হারিয়েছে আস্ত একটা দেশ। হারিয়েছে তার একেবারে নিজস্ব আশ্রয়। তার যেমন ফেরার পথ ফুরিয়ে গেছে, তেমনি এগিয়ে যাওয়ার আর পথ কই? তাকে আশ্রয় দেবে কে? “২০১৫ সালের হিসাব ধরলে পৃথিবীতে এমন আশ্রয়হীন লোকের সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ৬ কোটি ৫৩ লক্ষ। এই আশ্রয়হীন মানুষদের শতকরা ৭৭ ভাগই এশিয়া ও আফ্রিকার।”[৬] এই আশ্রয়হীন মানুষদের মধ্যে সবাই যে নিজের দেশেই

আশ্রয় হারিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে এমনটা নয় অনেকেই জাতিগত বা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার শিকার হয়ে নিজের দেশের মধ্যেই এক প্রান্ত থেকে ছুটে গেছে আশ্রয় নিতে আর এক প্রান্তে। এসবই ঘটে চলেছে উপযুক্ত নিরাপত্তাহীনতার খাতিরে। হিসাব করে দেখা গেছে "পৃথিবীর আশ্রয়হীন মানুষদের মধ্যে প্রতি চারজনের তিনজনই এরকম নিজের দেশে নিরাশ্রয় হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে বেড়ানো মানুষ।"[৭] এই ছুটে বেড়ানোর পালা আজও শেষ হয়নি, বরং বেড়েই চলেছে। এই ছুটে চলা মানুষেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে চিরকাল ধরে ছুটে চলেছে আজও। সেই ছুটে চলা, দিশা হারানো মানুষকেই আমি আমার গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নির্বাচন করেছি। তবে আমার আলোচনার প্রধান আধার ছোটগল্পকে অবলম্বন করেই বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য বিষয়টিকে আরো বেশি স্পষ্ট করার জন্য আমি একটি অধ্যায়ে সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণেও (মূলত: উপন্যাস, নাটক ও কবিতা) এই ছুটে চলা উদ্বাস্তু মানুষের নির্মম জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করেছি। মোটকথা এই বাস্তুহারা মানুষই আমার গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়, তাদের জীবনের করুণ রূপান্তরই এই গবেষণার মূল চাবিকাঠি।

আমার এই গবেষণা কর্মটিকে সুসম্পন্ন করার জন্য, আলোচনার পরিসরকে পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলতে মূল বিষয়টিকে আমি যেভাবে বিন্যস্ত করেছি, সেখানে প্রথমে আছে একটি প্রস্তাবনা, তারপরেই রয়েছে ছ'টি অধ্যায় এবং শেষে উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়

ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও উদ্বাস্তু সমস্যা

পৃথিবীর বৃহত্তম উদ্বাস্তু সমস্যার সূচনা হয় ভারতের স্বাধীনতা লাভের সমকালে, দেশভাগের মধ্য দিয়ে। এখানে '৪৭-এ ঘটে যাওয়া দেশভাগ বিষয়ে ঐতিহাসিক কারণ খোঁজা আমার অন্বিষ্ট নয়। কারণ ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করেছেন এবং মোটামুটি একটা ধারণা সকলেরই আছে। এই অধ্যায়ে আমি আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে এই উদ্বাস্তু মানুষের সমস্যার একটি রূপরেখা অঙ্কন করার চেষ্টা করেছি মাত্র। এই রূপরেখা প্রসঙ্গে উদ্বাস্তু ইতিকথা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আজও নিরাশ্রয় হয়ে হাজার হাজার মানুষ দিন কাটাচ্ছে মানবেতরভাবে।

প্রথমেই আসা যাক বেলজিয়াম উদ্বাস্তুদের কথায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় জার্মানরা বেলজিয়াম আক্রমণ করলে প্রায় আড়াই লক্ষ বেলজিয়াম অধিবাসী ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। তারা হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু। তারা গৃহহারা হয়ে চারি দিকে ছুটতে থাকে। আবার সোভিয়েতরা জার্মানদের আক্রমণ করলে অসংখ্য জার্মানবাসী বিশেষ করে ইহুদিরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। শুধু সোভিয়েতে আশ্রয় নেয় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রায় ৬০

লক্ষ মানুষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন দেশে আশ্রিত সর্বহারা ও শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি মানুষ।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) বিভিন্ন দেশে আশ্রিত সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, যুগোস্লোভাকিয়া ও জার্মান শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ছিল। এ সকল শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে সময় লেগেছিল পরবর্তী ১০ বছরেরও বেশি সময়। প্রাণ বাঁচাতে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া থেকে অসংখ্য ইহুদি ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়। শরণার্থীর থেকেও শোচনীয় বিষয় ছিল প্রাণনাশ। এই যুদ্ধে প্রায় এক কোটিরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায় ।

ধর্মের ভিত্তিতে '৪৭-র দেশভাগ সংঘটিত হয়। প্রাণ হারায় অগুনতি মানুষ। উদ্বাস্তু হয় অসংখ্য মানুষের দল। বাংলাদেশ হয়ে যায় পূর্ব-পাকিস্তান। ২৪ বছর যাবৎ পাকিস্তানে শোষণের পর্ব প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের জন্য শোষণের নামান্তর। '৭০-র নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অঙ্গুলি হেলনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা হারাতে দেয়নি শাসকরা। '৭১-র মার্চ মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা সে দেশে হত্যালীলা শুরু করে। এইসব পাকিস্তানিদের অবিচার, নৃশংসতা থেকে রক্ষা পেতে প্রাণের ভয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় প্রায় এক কোটিরও বেশি বাঙালি। দীর্ঘ ন'মাস বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অসহায় ভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে যুদ্ধ শেষে কিছু সংখ্যক মানুষ প্রত্যাগমন করে। আবার অনেক মানুষ অসহায় ভাবে ভারতেরই এই বঙ্গে উদ্বাস্তু হিসেবে জীবন আরম্ভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া অসহায় সর্বহারা ইহুদিরা আসতে থাকে ফিলিস্তিনে। তারা তাদের জন্য আলাদা দেশ ইজরায়েলের দাবি জানায়। ইজরায়েলের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী সময় থেকে স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের উপর বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ চালায় ইহুদিরা। ১৯৪৮-এর ইহুদি সৃষ্ট দাঙ্গায় কয়েক লক্ষেরও বেশি ফিলিস্তানি দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। এর পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে মিশর, ফিলিস্তিন ও সৌদি আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর যেমন অসহনীয় অত্যাচার অবিরত বাড়তে থাকে, তেমনি দখল করে নেওয়া হতে থাকে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। এর ফলস্বরূপ বাড়তে থাকে বাস্তুহারা ফিলিস্তিনের সংখ্যা- "বর্তমানে সিরিয়া, মিশর, লেবানন সহ বিভিন্ন আরব দেশে আশ্রয় পাওয়া ফিলিস্তানি শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ।"[৮]

সন্ত্রাসবাদ ও তাদের কার্যক্রম ও পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ করার অজুহাতে ২০০৩-এ ইরাক আক্রমণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ধ্বংস হয় শহর থেকে শহর। প্রাণ হারায় গণনাতীত অসহায় মানুষ। মার্কিনীদের আক্রমণে ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকে। প্রায় আট বছর ধরে হত্যাযজ্ঞ চলার পর ২০১১ সাল নাগাদ ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার করে যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধের আরম্ভ থেকেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় অসংখ্য ইরাকি মানুষ- "২০০৩ থেকে আজ

পর্যন্ত প্রায় ৪৭ লাখ মানুষ ইরাক ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে শরণার্থী হিসেবে পাড়ি জমিয়েছে। ২০ লাখেরও বেশি মানুষ তাদের ঘর, কর্মক্ষেত্র সব হারিয়ে নিজের দেশেই বর্তমানে শরণার্থীর মতো বসবাস করছে।”[৯]

এবার আসবো ২০১১ সালে ঘটে গেলেও আজকের সময়ের একেবারেই চর্চিত উদ্বাস্তু সিরিয়ানদের কথায়। ২০১১-তে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্বাস্তুরা ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রভাব পড়ে সিরিয়াতেও। সিরিয়ায় ক্ষমতায় থাকা বাশার আল আসাদের বিপক্ষে যুদ্ধে নামে আমজনতা। এরই জের ঠেকাতে বাশার আল আসাদ সেনা প্রণয়ন করেন। ফলে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় । বহু মানুষ একারণে মারা যান। বহু মানুষ অসহায় ভাবে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। এককথায় অসংখ্য সিরিয়ান মানুষ উদ্বাস্তুজীবন কাটাতে বাধ্য হয়। এই উদ্বাস্তুরা বিশেষ করে আশ্রয় নেয় জার্মান ও গ্রিসে। সিরীয় মানুষের অসহায়তার কথা আজও দৈনিক সংবাদপত্রে আমাদের নজরে আসে। এক সিরীয় শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার সময় আর্তনাদ করে বলেছিল- “আমি খোদার কাছে সব বলে দেব”[১০] এরই সাড়ে তিন মাস পরে একই বয়সী আর একটি শিশু আইলান কুর্দির নির্বাক মৃত্যু সারা ঘুমন্ত পৃথিবীকে জাগিয়ে দিয়েছিল। এই সিরীয়দের অসহায়তার কথা শুনলে আজও গা শিউরে ওঠে। অসংখ্য সিরীয় উদ্বাস্তু হয়ে জীবন কাটাচ্ছে, আবার অনেকে প্রাণ হারিয়েছে এই গৃহদ্বন্দ্বের কারণে ।

উদ্বাস্তু সিরিয়ানদের পর আমরা বলতে পারি বর্তমান সময়ে মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কথা। মায়ানমারের রাইখান প্রদেশের অধিবাসী, যাদের বেশিরভাগই ধর্মীয়ভাবে মুসলিম, এরাই মূলত রোহিঙ্গা জনগণ। এই রোহিঙ্গা সমস্যাতো পুরোনো একটা বিষয়। সেই মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে এই মানুষেরা অত্যাচারিত হয়ে আসছে, কখনো জাপানের অত্যাচার, কখনো মগধের আক্রমণ, আবার কখনো সরকার বাহিনীর নিপীড়নের শিকার হয়ে রোহিঙ্গারা নিজের দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তুজীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশ কাছাকাছি হওয়ায় প্রায় ৬ লক্ষ রোহিঙ্গা আশ্রয় পেয়েছে বাংলাদেশে। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নিজের জীবন বাঁচাতে তারা আজও উদ্বাস্তুজীবন কাটাচ্ছে ।

আমরা সবাই অধিকাংশ ’৪৭-র দেশভাগ তথা বাংলা ভাগ বিষয়ে বেশি অবগত কিন্তু তারও আগে-পরে এবং এখনো ঘটে চলা নানান রাজনৈতিক চক্রান্ত, রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহারের ফলে মানুষ বিভিন্ন দেশে উদ্বাস্তু হয়ে চলেছে অবিরত। তার পথ চলার শেষ নেই। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের উদ্বাস্তু হওয়া মানুষের ক্রন্দনের প্রেক্ষাপটই বলে দেয় উদ্বাস্তু মানুষের ঘর হারাবার ইতিকথা। সে হারিয়েছে তার বাড়ি। সে হারিয়েছে তার আপনজন। সে হারিয়েছে তার আস্ত একটা দেশ। ফলে উদ্বাস্তু চর্চা আজও এত প্রাসঙ্গিক ও

তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয় হয়ে উঠেছে। ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বিশ্বময় উদ্বাস্তু মানুষের এই সংকটই দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ে দেখাতে চেয়েছি উদ্বাস্তু সমস্যা দেশ-কালের সীমিত সীমারেখা ছাড়িয়ে বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের নানান দেশের একটা মর্মান্তিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও উদ্বাস্তু সমস্যা

এই অধ্যায়ের বিষয়টি আলোচনা করতে গেলেই প্রথমেই যে ট্র্যাজিক ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় তা হল ১৯৪৭-এ ঘটে যাওয়া দেশভাগের কথা। ১৯৪৭-এর দেশভাগের ফলে সৃষ্টি হল দুটি দেশ- ভারত ও পাকিস্তান, প্রতিষ্ঠা পেল ধর্মভিত্তিক মুসলমানের আলাদা বাসভূমি- পাকিস্তান। এই দেশভাগের ফলেই যে মানুষ সদ্য উদ্বাস্তু হয়েছে- সে হারিয়েছে তার ঘর, তার পরিজন। সে হারিয়েছে তার নিজের বাসভূমি। বিভাজন রেখা কোথাও যেন প্রতিটি উদ্বাস্তু মানুষের সত্তাকে কেটে ফালি ফালি করে দিয়েছে। রাজনৈতিক চক্রান্তে তারা নিঃসম্বল হয়ে পাড়ি দিয়েছে অজানা অন্য এক দেশে। এই সদ্য উদ্বাস্তু হওয়া মানুষগুলো শুধুমাত্র যে তার পরিচিত পরিবেশ হারিয়েছে তা নয়, পাশাপাশি সে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে। তাকে সামাজিকভাবে অবহেলিত হতে হয়েছে। তাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। আর রাজনীতির দিক থেকে সে অবহেলিত বটেই। এইসব মানুষদেরকে নিয়ে প্রথমাবধি নানান ধরনের সাহিত্য রচনা করা হয়েছে, হচ্ছে। বাংলা ছোটগল্পের শাখা এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ। একাধিক ছোটগল্পকার তাঁদের ছোটগল্পে উদ্বাস্তু হওয়া মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানান সংকটের কথা তুলে ধরেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায়। উদ্বাস্তু হওয়ার ফলে মানুষ তার পরিচিত সমাজ ছেড়ে নতুন সামাজিক পরিবেশে এসে সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। আবার অর্থনৈতিক দিক থেকে যে মানুষ তার পরিচিত পরিবেশে একেবারেই সুস্থ জীবন যাপন করছিল তাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবরকম ভাবে পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। আর রাজনীতির কথা বলতে গেলে- কিছু মানুষ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই রাজনৈতিক চক্রান্তের আবর্তে সাধারণ মানুষকে চরম সংকটে ফেলে দিয়েছে। এক অর্থে রাজনৈতিক চক্রান্তের বলি হয়েই মানুষের এই উদ্বাস্তু দশা। রাজনৈতিক চক্রান্তের কারণে কোন কোন মানুষের মধ্যে যতটুকু সামাজিকতা বা মানবিকতা বেঁচে ছিল তাও ফুরিয়ে এসেছিল। সৃষ্টি হয়েছিল ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব। যখন সে দেখেছিল তারই নববধূকে ধর্ষিতা হতে, যখন সে দেখেছিল তার মা-বাবাকে চোখের সামনে খুন হতে বা যখন সে দেখছিল তার প্রতিবেশীরা আজ তাকেই মারতে উদ্যত, তখন সেও তার মানবিকতা আর

বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। এসবের মূলে আসলে কাজ করেছে সেই রাজনৈতিক চক্রান্ত। এরকম কিছু ঘটনার নির্মম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ছোটগল্পকারদের গল্পে।

'উদ্বাস্তু' শব্দটির আবির্ভাব মানুষের বিপন্নতার সাথে জড়িত। মানুষের নিরাপদ আশ্রয় হারাবার সাথে জড়িত। 'উদ্বাস্তু' শব্দটির মধ্য দিয়ে কোথাও যেন লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তাক্ত ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে। পার্টিশনের হাত ধরেই আবির্ভাব ঘটেছিল 'উদ্বাস্তু' শব্দটির। আবির্ভাব ঘটেছিল 'রিফিউজি' নামক নতুন আর একটি শব্দ। দুই বঙ্গের মানুষ একটু অবহেলা ভরেই 'রিফিউজি' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই 'রিফিউজি'র বাংলা 'উদ্বাস্তু' শব্দটা তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহার করা হয়। শব্দটা কম ব্যবহার করা হলেও উদ্বাস্তু মানুষের আর্তি কিন্তু আজও আমরা একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের অন্তিম লগ্নে এসেও প্রবলভাবে লক্ষ্য করতে পারি। আজও মানুষ পাড়ি দিতে বাধ্য হয় নিজের চেনা-পরিচিত স্বপ্নে গড়া চার দেওয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে অপরিচিত পরিবেশে। কত মানুষকে দেশ ছাড়তে হয়েছে, কত মানুষ নিজেই নিজের দেশে নির্বাসিত। কবে নিশ্চিত ভাবে মানুষ এই ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে রেহাই পাবে? তা বলা অসম্ভব। আইলান কুর্দির মৃতদেহ বোধহয় সেই বার্তাই রেখে গেছে আমাদের কাছে। তুরস্কের প্রধান পর্যটন কেন্দ্রের সামনে সমুদ্রের পাড়ে তিন বছরের ফুটফুটে মৃতদেহটি নিথর হয়ে পড়েছিল। লাল জামা পরা আইলান তুরস্ক ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এসেছিল। সে নিরাপদ আর থাকতে পারল কই? হল তার সলিল সমাধি। মারা গেলেও তার পরিহিত লাল জামা কোথাও যেন অন্য এক ইস্তেহার ঘোষণা করেছিল। স্তব্ধ করে দিয়েছিল গোটা বিশ্বকে। ভারতভাগের স্মরণীয় দুর্ঘটনার মেটাফর রূপে আইলানের মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি যেন বিভাজিত মানুষকে আরো বেশি উস্কে দিয়েছিলো, চেতনার গাঢ় অস্তরাগে।

আসলে ভারতভাগের ফলেই মূলত এই উদ্বাস্তু সমস্যা। ভারতভাগ এই উপমহাদেশের সবথেকে ট্র্যাজেডিময় অভিঘাত। এরই ফলস্বরূপ উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার। এই হাহাকার শুধুমাত্র জল-জঙ্গল-জমির উপর দিয়ে র‍্যাডক্লিফের লাইনের হন্তারক সীমানা টানা নয়, মানুষের মনন-বিশ্বাস-সংসার-আত্মজন সবকিছুর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিচ্ছেদের রক্ত খেলা। এক বিরাট অংশের মানুষের দল অস্তিত্বের সংকটে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছিল। নিজের ভিটেমাটি, নিজের শিকড় বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কতটা মর্মান্তিক তা আজও উদ্বাস্তু মানুষের বুকের মধ্যে জমাট বাধা বোবা কান্নায় তার প্রমাণ রেখে গেছে সাহিত্য ও সমাজের মূলে। আগেও বলা হয়েছে, ঘটে যাওয়া উদ্বাস্তু সমস্যার কথা নানান সময় নানান ধরনে বিভিন্ন সাহিত্যিকের কলমে প্রতিফলিত হয়েছে। শুধুমাত্র উপন্যাস, নাটক, কবিতা নয়, ছোটগল্পেও উদ্বাস্তু মানুষের যন্ত্রণা বারে বারে সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে নতুন আশ্রয় পেয়েছে। এই অধ্যায়টিতে আমি নির্বাচিত কিছু গল্প (যেমন: অঞ্জলি দেবীর 'নবীন আশার খড়্গ', কালি নাগের 'নবজাতক', মিহির মুখোপাধ্যায়ের 'জীবিকা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিদিশা', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'অপমান') নিয়ে

সেই বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সেটা সামাজিক হোক বা রাজনৈতিক বা হতে পারে অর্থনৈতিক। এখানে মূলত উদ্বাস্তু মানুষের নানামুখী বিপর্যয়ের কথাই আমার আলোচনায় প্রাধান্য পাবে। প্রাধান্য পেয়েছে তাদের জীবনের অদ্ভুত এক রূপান্তরের প্রতিচ্ছবি।

তৃতীয় অধ্যায়

সাংস্কৃতিক-ভাষাগত পরিবর্তন: উদ্বাস্তুর আত্মসংকট ও বাংলা ছোটগল্প

বাংলা ছোটগল্পের মাধ্যমে আমি এই অধ্যায়ে মূলত দেখিয়েছি সংস্কৃতি এবং ভাষা পরিবর্তনের ফলে উদ্বাস্তু মানুষ কিভাবে চরম সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। এখন প্রশ্ন, মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কি? প্রশ্নের সহজ উত্তর হিসাবে অল্পবিস্তর সভ্যতার আদি ইতিহাসের সাথে পরিচিত যে কেউ বলবেন—'আগুন'। সত্যিই সভ্যতার ইতিহাসে আগুনের আবিষ্কার না হলে, মানুষ এখনো কাঁচা মাংস খাওয়া আদিম মানবের পর্যায়ভুক্তই থেকে যেত। বা হয়তো আগুনের আবিষ্কার ছাড়া মানবজাতি তার প্রাথমিক আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাটুকুতেও ব্যর্থ হত, কারণ আগুনের ব্যবহারই মানুষকে সেই সময় বিভিন্ন হিংস্র, মাংসাশী প্রাণীকুলের থেকে আত্মরক্ষায় এবং প্রয়োজন-ভিত্তিক শিকারেও সাহায্য করেছে। তাই গ্রিক মিথের প্রমিথিউসের আখ্যান থেকেও আমরা জানতে পারি, প্রমিথিউস সৃজিত সর্বগুণ সম্পন্ন কিন্তু আত্মরক্ষায় দুর্বল, নখ-দাঁত হীন মানবজাতিকে, জিঘাংসু ও শক্তিশালী প্রাণীকূলের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেবতাদের কাছ থেকে প্রমিথিউসের আগুন চুরির আখ্যান। ফলত, আগুনকে মানবসভ্যতার ইতিহাসেও দেখা হয়েছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসেবে। আগুন ছাড়া সভ্যতার ইতিহাসের বাঁকবদলকারী ঘটনা (paradigm shift) হিসাবে চিহ্নিত তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ, লৌহযুগ ইত্যাদির সূচনাও ঘটত না। তাই, সভ্যতার ইতিহাসে আগুনকে ধরে রাখার, ব্যবহার্য করে তোলার, নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা ও সাফল্য, নিঃসন্দেহে এক মাইলফলক।

আগুনের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস না করে আমরা বলতে পারি, মানবসভ্যতার ইতিহাসে আরেকটি তুলনায় কম গুরুত্ব পেয়ে আসা, কিন্তু হাল আমলের বিদ্যাচর্চার অন্যতম মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠা, 'ভাষা'র আবিষ্কার কোনও অংশেই কম বড়ো ঘটনা নয়। ভাষা, এককথায় আমাদের জগৎকে মূর্ত করে তোলে। অন্যভাবে বললে বলা যায়, ভাষা হল এমন একটি sign system, যা ছাড়া আমাদের জগৎ বিমূর্ত। ভাষা বা কোনও sign system ছাড়া বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ব্যক্তি গোষ্ঠীবদ্ধ হতে পারবে না, তাই-ই নয়, একক বিচ্ছিন্ন মানুষ তার পরিবেশ ও নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না কোনও আন্তঃসম্পর্ক। এটাও বলা যায় মানবিক চেতনার সূক্ষ্ম স্তরে তা পেলেও, দ্যোতিত করতে পারবে না কোনও বোধগম্য প্রকাশ ভঙ্গিতে। এছাড়াও প্রাথমিকভাবে ভাষা মানুষের দৈনন্দিন মানবিক প্রকাশগুলি বা মনজ বোধ ও উপলব্ধির অনুবাদগুলিকে আদল দেয়।

তাই একক ব্যক্তির নিজের মননের সাথে নিজের সম্পর্ক এবং তা অতিক্রম করে এককের সাথে ব্যষ্টির সম্পর্ককেও তৈরি করে তাদের ভাষা।

এই মৌল ভাবনাকে ছেনে আমরা বলতেই পারি, সংস্কৃতি ও ভাষা, একটি বিচ্ছিন্ন মানুষ ও তার গোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্কের সেতু হিসাবে কাজ করে। কারণ সংস্কৃতিও ভাষারই মত। তার পূর্বপুরুষের ইতিহাসকে মূর্ত ও বিধৃত করে। যা আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বললে কম বলা হয়, এটি ভাষারই মত মানবচেতনার চলমান ও স্রোতস্বিনী একটি প্রবাহ। নিজেও এই প্রবাহের একটি অংশ হওয়ায়, একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে সেই গোষ্ঠীর কোনও বিচ্ছিন্ন মানুষ কখনই অতিক্রম করে উঠতে পারে না। মানব মননের অবচেতন থেকে তার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে সাড়া দেয় তার পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি ও ভাষা।

ভাষা ও সংস্কৃতি যে মানব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, সেকথা স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় কোনও জনগোষ্ঠীর ইতিহাস নির্মাণে তাদের সমাজ ইতিহাস ও ভাষার কালানুক্রমিক বিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্ববহ। ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পূর্বে ‘চলমান’ বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে, এর কারণ হল ভাষা বা সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল স্থিতিস্থাপক। স্থিতিশীলতা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে রক্ষণশীলতা। অবশ্যই, কোনও সংস্কৃতি তার পালনকারীদের অধিক সচেতনতার ফসল হিসাবে রক্ষণশীল হতেই পারে, তা সচেতনভাবে অন্যান্য সংস্কৃতির টুকরো-টাকরা বৈশিষ্ট্য গ্রহণে অরাজি এবং মিশ্র সংস্কৃতির চর্চায় বিমুখ হতেই পারে। কিন্তু সংস্কৃতির স্বাভাবিক ধর্ম তা নয়। ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও, ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চাতে অর্থনীতি, রাজনীতি, ক্ষমতা, অ্যাকাডেমিক পরিসরের অনুপস্থিতি বা উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় তার রক্ষণশীল হওয়া না হওয়াকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু একথা বলাই যায় যে, এ সমস্ত বিষয় থাকুক বা না থাকুক, ভাষা ও সংস্কৃতি স্বভাবতই ব্যপনধর্মী, তা অন্য ভাষা অন্য সংস্কৃতির সাথে নিয়ত লেন-দেন করে চলে, তাই তার পরিবর্তন হয়, চলনে গতিতে আর প্রসারের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে।

ভাষা ও সংস্কৃতি একটি সমাজের দুটি স্তম্ভ। ভাষা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু হতে পারে না। মানুষ সামাজিক জীব— ভাষা সামাজিক মানুষের সৃষ্টি। এমন কোন ভাষিক তত্ত্ব হতে পারে না, যা সামাজিক নয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই বিষয় আমরা বলতে পারি। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে নৃতত্ত্ব আলোচনায় আগ্রহের জোয়ার আসে। এই নৃতত্ত্ব আলোচনাই ভাষা-সংস্কৃতির ইতিহাসকে সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখা শুরু করল। নৃতাত্ত্বিক-এর কাজ কেবল আচরণের সূত্র আবিষ্কার করা নয়, নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আচরণের ব্যাখ্যা করার জন্য সংকথন বা communication এর ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রটি সাধারণত ব্যাকরণিক এবং নৃবৃত্ততাত্ত্বিক বর্ণনার মধ্যেকার ফাঁক পূরণ করতে

পারে। পাশাপাশি, ব্যাকরণ ও অভিধান ভাষীকে শেখায় ভাষার সূত্র ও শব্দাবলী। কিন্তু ভাষীর পক্ষে ভাষা ব্যবহারের সূত্রাবলী ও শব্দভাণ্ডার শেখাই যথেষ্ট নয়, ব্যাকরণিক ক্ষেত্রের বাইরে থাকা সেই সমাজের সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিবেশও ভাষীর অনুধাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণে বলা চলে, কোনও সমাজে ব্যবহৃত আঞ্চলিক প্রবাদের ক্ষেত্রে, ভাষা তার বক্তব্যের অতীত বিশেষ সাংস্কৃতিক দ্যোতনা দেয়, যা কেবল ভাষাটি জানলে বোঝা অসম্ভব হয়। তাই কোনও সমাজের পূর্ণরূপ সদস্যপদ দাবি করতে হলে ভাষীকে, সেই ভাষা শিখতে হবে সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্তভাবে।

সুতরাং, নৃতত্ত্বের আলোকে ভাষা ও সংস্কৃতিকে সংকথনের আওতায় ফেলা যায়। আবার প্রতি সমাজের নিজস্ব সংকথন থাকে। তাই জৈবিকভাবেই সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা একই সূত্রে আবদ্ধ। সে কারণে বলা যায় ভাষা ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। পরিবেশ বদলের সাথে সাথে দুয়েরই বদল ঘটে যায়। এই বদলে যাওয়া নতুন পরিবেশ-ভাষা-সংস্কৃতিতে আসার পর উদ্বাস্তু মানুষের জীবন-যাপনে নানাবিধ সংকটের আবির্ভাব ঘটে। আমি এখানে নতুন পরিবেশে অনিচ্ছার পরেও ঠেলে ওঠা এইসব উদ্বাস্তু মানুষদের পালটে যাওয়া জীবনের ছবি বেশ কিছু ছোটগল্পের (যেমন: জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘সেই ছেলেটা’, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাফের’, সন্তোষকুমার ঘোষের ‘দ্বিজ’) মাধ্যমে আলোচনা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্বাস্তু জীবনের গল্পে বাঙালির রূপ ও রূপান্তর

চল্লিশের দশকে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা গল্পের প্রধান বিষয় ছিল দুর্ভিক্ষের হাহাকার। দূরাগত অভিবাসন সমস্যা ও তৎপরবর্তী ক্ষেত্রে ধর্মের জিগিরে গণহত্যা, অপর দিকে কাতারে কাতারে আসা শরণার্থীদের জন্য জনবিস্ফোরণ ও শরণার্থী শিবিরে স্থানসংকুলান সমস্যা ইত্যাদির সম্মুখীন তখনও আমরা হইনি। স্বাভাবিক ভাবেই দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু পরিস্থিতির বাস্তব ও জান্তব চিত্রণের বদলে তাই আমরা প্রথম দিকে কেবল হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য ও প্রীতির বার্তায় ঢাকা, নরম-সরম ভাবপ্রবণ গল্প পেয়েছিলাম। ১৯৪৭-এর পর থেকেই দেশবিভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক স্তরে জীবনের নানা বিপর্যয়, ধ্বংস প্রাপ্ত মূল্যবোধের পাশাপাশি গোষ্ঠী জীবনের প্রভাবমুক্ত, শ্রেণি বিভক্ত ব্যক্তি জীবন বাংলা ছোটগল্পে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তি জীবনে যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলা ছোটগল্পে তা ধরা পড়েছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে। সমালোচকের মতে, “এই কালপর্বে সামাজিক বিপর্যয় আর ব্যক্তিপরিচয়ের প্রতিষ্ঠা দু’য়ে মিলে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে যে বেগ সঞ্চার করেছে, তা পূর্বেকার ছোটগল্পের ছিল না”[১১]

আগেকার বাঙালি জীবনে নিহিত শান্তি সুস্থিতি ভারসাম্য সামঞ্জস্য বাংলা ছোটগল্প থেকে বিদায় নিয়েছে এই কালান্তরের নতুন পর্বে, আজ কলোনিয়াল বাঙালির যে সংকট আমরা দেখি চড়ুই পাখির খোপের মতো ফ্ল্যাটবাড়ির অভ্যন্তরের যাপনে অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির মধ্যে, তার অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক। এই মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত যে গোষ্ঠীবদ্ধ পরিবার জীবনের লোপ, যৌথ পরিবারের ভেঙে যাওয়া ও নগরমুখীনতা– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন এই যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া, গ্রাম-দেশকে স্মৃতির তাকে তুলে রেখে মা-বাবাকে গ্রামের বাড়িতে ছেড়ে নগরে এসে ঠাঁই নেওয়ার যে আধুনিক প্রবণতা, তা শুরু হয়েছিল কার্যত বাঙালির দেশভাগ পরবর্তী গণ-অভিবাসন থেকেই। দেশভাগ ও তার তাৎক্ষণিক প্রভাব ইত্যাদি থেকে পরবর্তী ক্ষেত্রে এই ছিন্নমূল একাকীত্বের যে যন্ত্রণা, তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে লিখিত হয়েছে বিভিন্ন ছোটগল্প। এবং এই কালান্তরের পর্বে দেশবিভাগ সম্পর্কিত যে গল্পগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যেও পূর্বে উল্লিখিত লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট। অধ্যায়টিতে নির্বাচিত কিছু গল্প (যেমন: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্থানে ও স্তানে', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মধুবন্তী', দেবেশ রায়ের 'উদ্বাস্তু') অবলম্বনে উদ্বাস্তু মানুষের জীবনের রূপান্তরিত নানাবিধ সমস্যার কথা আলোচনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্বাস্তু সমস্যার রূপ ও রূপান্তর: বাংলা ছোটগল্প ও অন্যান্য সাহিত্য প্রকরণ

এই অধ্যায়ের আলোচনার মূল বিষয় হয়ে উঠছে সেই উদ্বাস্তু সমস্যারই কথা। তবে অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে যেহেতু 'বাংলা ছোটগল্প' ও 'অন্যান্য সাহিত্য প্রকরণে'র কথা বলা আছে, তাই বিষয়টি প্রথমেই স্পষ্ট বলে নেওয়া দরকার যে এখানে স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের পাশাপাশি ছোটগল্পেও উদ্বাস্তু সমস্যার কথা আলোচনা করা জরুরি, কিন্তু অন্যান্য অধ্যায়ে যেহেতু ছোটগল্প নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে মূলত আমি সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণ বিশেষ করে উপন্যাস, নাটক ও কবিতার উপর জোর দিয়েছি। উপন্যাস, নাটক ও কবিতায় উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকারের কথা বেশি করে বলতে চেয়েছি। এই অধ্যায়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি উদ্বাস্তু সমস্যা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কখনো সেই সাহিত্য হয়ে উঠছে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বিবরণ, আবার কখনো তা হয়ে উঠছে ইতিহাস ও রাজনীতির পক্ষপাতদুষ্টতায় পূর্ণ, আবার কখনো সেই সাহিত্য হয়ে উঠছে নারীত্বের অবমাননার ইতিকথা। কখনও তা হয়ে উঠছে স্মৃতিচারণা ও বিষাদময়তায় ঘেরা। এখানে দেখানো হয়েছে মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও দারিদ্রতার চিত্র। এসবের পাশাপাশি লেগেই আছে উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার, পুরনো বসতি ছেড়ে নতুন বসতির জন্য বিশাল এক সংগ্রাম।

দেশবিভাগের লেখালেখি নিয়ে বা উদ্বাস্তু মানুষের সংকটের কথা সাহিত্যে তুলে ধরা নিয়ে একদল মানুষের ধারণা ছিল যে ছিন্নমূল বা উদ্বাস্তু মানুষজনের ভয়াবহ সংকটের কথা বা দেশভাগ নিয়ে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অপ্রাচুর্যতা আছে। এই মতামত পুরোপুরি সেই অর্থে সত্য নয় কারণ, অনুসন্ধানের অলসতায় প্রকৃত সত্যটা চাপা পড়ে গেছে। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে সাহিত্য রচনায় খামতি নেই বরং সাহিত্যে উদ্বাস্তু মানুষের প্রাধান্য এতটাই বেশি তা রীতিমতো বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিশেষ করে বিগত এক দশকে উদ্বাস্তু মানুষের অসহায়তার কথা সাহিত্যে যেভাবে ধরা পড়েছে, যেভাবে আলোচনা করেছেন সাহিত্যিকরা (ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবিরা) তা বিশেষ করে অবাক করার মতোই। এই অধ্যায়ে, উদ্বাস্তু মানুষকে নিয়ে যে বিপুল সংখ্যায় উপন্যাস, কবিতা, নাটক লেখা হয়েছে, তার সব আলোচনা করে, উদ্বাস্তু মানুষের ইতিবৃত্তকে সম্পূর্ণভাবে দেখানো সম্ভব নয়। তবুও স্বল্প পরিসরে যথাসম্ভব আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি এখানে নির্বাচিত কিছু উপন্যাস (যেমন: জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন', নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প'), কিছু কবিতা (যেমন: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'উদ্বাস্তু', জসীমউদ্দীনের 'বাস্তুত্যাগী', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ধাত্রী', দীনেশ দাসের 'পনেরই আগস্ট ১৯৪৭'), কিছু নাটকে (যেমন: সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী', বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল') উদ্বাস্তু সমস্যার রূপান্তরের যে চিত্র নির্মিত হয়েছে সেটাকে দেখানোর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উদ্বাস্তু জীবনের গল্প: প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল

এমন একটি অধ্যায় এই গবেষণায় রাখার মূল উদ্দেশ্যই আসলে উদ্বাস্তু সমস্যার প্রেক্ষাপটকে সংকীর্ণ না রেখে সামগ্রিক ভাবে বুঝে নেওয়া। কেননা উদ্বাস্তু বিষয়ক চিন্তা-চেতনা সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও বিস্তার লাভ করেছে। তাই আমি এই অধ্যায়ে উদ্বাস্তু সমস্যার চিত্র শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিনি বরং উদ্বাস্তু সমস্যার রূপ ও রূপান্তরের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কিছু ছোটগল্পের মধ্য দিয়েও আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যেমন পাকিস্তানের গল্পের মধ্যে আখতার জামালের 'আমার ছিন্ন আঙুল', জামিলা হাসমির 'নির্বাসন', সাদত হাসান মান্টোর 'খোদার কসম' ছাড়াও কয়েকজন গল্পকারের গল্পের আলোচনা আছে অধ্যায়টিতে। আবার বাংলাদেশের গল্পের মধ্যে হাসান আজিজুল হকের 'খাঁচা', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', আজিজুল হকের 'মৃত্যু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'র মতো গল্পও আলোচনা করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি প্রাদেশিক স্তরের কিছু গল্পের আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে। তবে প্রাদেশিক ছোটগল্পে দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা বিচার করার ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল, তা সমাজকে

প্রতিফলিত করে। প্লেটো তার বহুচর্চিত 'রিপাবলিক' গ্রন্থে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সাহিত্যের জগৎ হল বাস্তব জগতের এক অনুকৃতি। তাই প্রাদেশিক স্তরের ভারতীয় সাহিত্যে যখন 'উদ্বাস্তু জীবন' সমস্যা গল্পের প্লটে মুখ্য হয়ে উঠে আসে, ধরে নেওয়া যায় তা সমাজের প্রতিফলন স্বরূপ সাহিত্যে এসেছে। অন্যভাবে বলা যায়, বাস্তব সমাজে উদ্বাস্তু জীবনের প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করে তা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ার বা সাহিত্যে অনুকরণ করার প্রয়াস পান লেখকরা। তাই বাস্তবে, ভারতের যে প্রদেশগুলি দেশভাগ জনিত বিবিধ সমস্যায় অন্যান্য প্রদেশের থেকে বেশি আলোড়িত হয়েছিল, সেই সব প্রদেশের প্রাদেশিক সাহিত্যে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন উঠে এসেছে বেশি। পাকিস্তান-ভারত ভাগে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পাঞ্জাব প্রদেশের উর্দু (ইসমৎ চুগতাইয়ের 'বাচ্চা'), সিন্ধি (নারায়ণ ভারতীর 'দলিল') ও পাঞ্জাবি (কর্তার সিং দুগ্গালের 'নতুন বাড়ি') সাহিত্যে এবং বাংলা প্রদেশের বাংলা সাহিত্যে তাই দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা চরমভাবে প্রতিফলিত। এছাড়াও অধ্যায়টিতে মারাঠি (এন. জি. গোরের 'মুখ ভর্তি জল, মুখ ভর্তি খুন'), তামিল (শুভ্র ভারতী মনিয়ানের 'উদ্বাস্তু'), মালয়ালম (ললিতাম্বিতা অন্তরাজনমের 'ঝড়ের মুখে একটি পাতা'), হিন্দি (কৃষ্ণা সোবাতির 'আমার মা কোথায় ?') ছাড়াও অনান্য ভাষার লেখকদের ছোটগল্পের অবতারণা করেও উদ্বাস্তু মানুষের চরম সংকটের কথা বলেছি।

আসলে আন্তর্জাতিক ও প্রাদেশিক পরিসরে ছোটগল্পকারেরা তাদের ছোটগল্পে প্রধানত অসহায় উদ্বাস্তু মানুষের চরম সংকটের কথাই বলেছেন, বলেছেন সেইসব মানুষের নীড় ভাঙার বেদনার কথাও। তাদের গল্পে আমি পেয়াছি বাস্তুচ্যুত উদ্বাস্তু মানুষের জীবন জীবিকা রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার ইতিকথা। এইসব ছোটগল্পে বিভিন্নভাবে উদ্বাস্তুর যে জীবন-চরিত, যাপন ও সংকট উঠে এসেছে তাও দেখানো গেল। অঞ্চলভেদে ও স্থানভেদে সমাজবাস্তব ও ইতিহাস অনুযায়ী এই উদ্বাস্তুর আখ্যান কখনো করুণ, কখনো দৃপ্ত, কখনো আবার উঠে দাঁড়ানোর লড়াই।

উপসংহার

আমার গবেষণায় উদ্বাস্তু মানুষগুলোর সুস্থ জীবন যাপন দেশভাগের পর কেমন ভাবে রূপান্তরিত হয়ে একটা অভিশপ্ত অধ্যায়ে পতিত হলো, সেই বিষয়টিকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আসলে লেখকেরা কেউ সরাসরি দেশভাগের ভয়াবহতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, কেউবা এই ভয়াবহতার কথা শুনেছেন। তাঁদের সেই শোনা কথা বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা পদ্মা- মেঘনা-ধলেশ্বরীর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে তাঁদের সাহিত্যে। শৈশব-কৈশোরের ফেলে আসা স্মৃতি, জন্মস্থান তাদের লেখায় ধরা পড়েছে। আজও সেইসব উদ্বাস্তু মানুষের চোখের জল সাহিত্যের পাতা ভিজিয়ে দেয়। ঠিক একই রকমভাবে এ বাংলা থেকে যারা ও বাংলা চলে গিয়েছিল

তাদেরকে নিয়েও বাংলায় সাহিত্য রচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমার আলোচনার বিষয় আমি পশ্চিমবঙ্গের বৃত্তে সীমাবদ্ধ রেখেছি। একটা মানুষ যে দীর্ঘদিন ধরে তার পরিচিত বেষ্টনীতে বসবাস করেছে। অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তার পরিবেশ, তার পরিচিতি বিষয়ে। হঠাৎ একটা সময়ে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে দাগাদাগির আঁচড়ে তাদেরকে আছড়ে পড়তে হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তে। মানুষের জীবন কিভাবে বদলে গেল সেটাই দেখানো হয়েছে এখানে। নৃশংস হত্যালীলা তাদের জীবনকে মুহূর্তে বদলে দিয়েছে। কখনো কলোনি, কখনোবা স্টেশন চত্বর তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়ে উঠেছে। কখনোবা মেয়েরা তাদের আব্রু বাঁচাতে না পেরে নিজেদেরকে বিকিয়ে দিয়েছে বাজারে। হয়ে উঠেছে বাজারু; কখনো অর্থের তাগিদে, কখনো আবার অপারগ হয়ে। এরকমই নানান রূপান্তরের কথা, উদ্বাস্তু মানুষের জীবন পরিবর্তনের রূপরেখা আমি আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছি।

আমার গবেষণায় দেখানো হয়েছে উদ্বাস্তু মানুষের শিকড় ছিড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। সব হারিয়ে তারা যখন একটা নতুন পরিবেশে এসে ওঠে, যে পরিবেশ একেবারেই তার নিজের নয়, সেরকম পরিস্থিতিতে তাদের নানান রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। তা আমরা ভুলি কি করে? তবে সব সময় কিন্তু গল্পকারেরা সব হারানোর হাহাকারকে গল্পের আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেননি। নতুন দেশে, নতুন সমাজ-পরিবেশে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে টিকে থাকার জন্যও যে লড়াই করা যায়, সে কথাও গল্পের মধ্যে বলেছেন। সুতরাং এইসব গল্পকারেরা গল্পে শুধুমাত্র উদ্বাস্তু হয়ে পড়া মানুষের জটিল জীবন সমস্যা নয় পাশাপাশি সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজার সন্ধানও দিয়েছেন।

দেশভাগ মানে যে শুধু কাঁটাতারের বেড়া নয়, এটা অধিকাংশ বাঙালির বর্তমান সময়ে মনে রাখা উচিত। কাঁটার দাগ মানুষের মননে, চিন্তনে, জীবনযাত্রায় রয়ে গেছে। তাই আজও ঘটি-বাঙালের দ্বন্দ্ব, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলাকে কেন্দ্র করে নোংরা তরজার চিত্র উঠে আসে। এই কাঁটা এপার বাংলা-ওপার বাংলার মানুষের মধ্যে এখনো বর্তমান। তাই দেশভাগ মানে শুধু দাঙ্গা নয়, ঘর হারানো নয়, ছিন্নমূল হওয়া নয়, তাতে মিশে আছে এক বিরাট সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভোলবদলের চিত্র, যা উদ্বাস্তু এবং এপার বাংলার মানুষের মধ্যে কখন যেন অগোচরে এসে সব বদলে দিয়ে চলে গেছে।

ঘটি, না বাঙাল? এদেশীয় পশ্চিমবঙ্গীয়রা(ঘটি) এই প্রশ্নে কতখানি দায়বদ্ধ? সংখ্যাগুরু হয়ে, বিপন্ন সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক সমসত্ত্বীভবনের প্রয়াসটি কি তারা করেনি? এক একীভূত 'বাঙালি' আইডেনটিটিই যখন লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল, ইলিশ-চিংড়ি, ঝাল-মিষ্টি, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ইত্যাদির আরো নানাবিধ পপুলার তর্কে 'ঘটি-বাঙাল' বাইনারির যে পুনঃপুন উল্লেখ ও পুনরাবিষ্কার, তা কি এই সব ঠাট্টা-ইয়ার্কির স্তরে হলেও সেই 'উদ্বাস্তু' আইডেনটিটিরই এককালীন ফারাকটুকুকে তুলে ধরে না? মজাচ্ছলে অর্ধশতক ব্যাপী চলে আসা এইসব তর্কে,

উদ্বাস্তু এবং না-উদ্বাস্তুর বিভাজনের সূত্রটিই কি আমাদের বাঙালি মননে বিধৃত নেই? আমরা এজাতীয় প্রতিটি মজায় কি সেই সংকীর্ণায়ন ও অপরায়ণকেই প্রশ্রয় দিই না ঘটি-বাঙাল নির্বিশেষে?

মানবজাতির ইতিহাসে এই ঘটনা সত্যিই 'ইতিহাস'...কিন্তু চেতনায় উদ্বাস্তুর অপরায়ণ বা উদ্বাস্তুর আত্মসংকট আজও শেষ হয়নি। সমাজের কালেকটিভ আনকনশাসনেসে এর পরেও এই চেতনা থাকবে— বয়ে যাবে এক সংগ্রামের, বঞ্চনার, ঘুরে দাঁড়ানোর স্থিতিস্থাপক স্মৃতি হয়ে।

তথ্যসূত্র:

১। ভট্টাচার্য তাপস, 'বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২৫শে বৈশাখ ১৪১১, পৃ: ১১

২। তদেব, পৃ: ১১

৩। তদেব, পৃ: ১১

৪। তদেব, পৃ: ১১

৫। বিশ্বাস অধীর (সম্পাদক), শরণার্থী, 'গাঙচিল' পত্রিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক সূচনাসংখ্যা, গাঙচিল, কলকাতা, জুলাই ২০১৭, পৃ: ১৪

৬। তদেব, পৃ: ১৪

৭। তদেব, পৃ: ১৪

৮। চৌধুরীস্বরূপ ফয়সাল, যুগে যুগে শরণার্থী, নতুন ধারার দৈনিক, আমাদের সময়, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ (ই-পেপার), পৃ: ২

৯। তদেব, পৃ: ২

১০। বাহাউদ্দীন এ.এম.এম, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১০ এপ্রিল ২০১৮ (ই-পেপার), পৃ: ৪

১১। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০, পৃ: ৩৩৯

প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মে সহায়ক গ্রন্থসমূহ (লেখকের 'পদবী' অনুসরণে বর্ণানুক্রমিক সারণি)

প্রাথমিক বা আকর গ্রন্থপঞ্জি

১। কামালী সাদ (সম্পাদনা), 'বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্প', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

২। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯০

৩। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী', নবম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯২

৪। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'অর্জুন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭১

৫। ঘোষ বারিদবরণ (সম্পাদনা), 'সমকালীন সাহিত্য, বঙ্গ ভঙ্গ', পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৫

৬। চক্রবর্তী রথীন (সংকলন ও সম্পাদনা), 'ঋত্বিক ঘটকের নাটকসংগ্রহ', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৮

৭। চক্রবর্তী শঙ্কর প্রসাদ (সংকলন ও সম্পাদনা), 'দেশভাগের কবিতা', একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১০

৮। চট্টোপাধ্যায় সাধন (সংকলন ও সম্পাদনা), 'দেশভাগের গল্প, রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য', গাঙচিল, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬

৯। চট্টোপাধ্যায় সুদিন, দাশ শচীন (সম্পাদনা), 'দাঙ্গা ও দেশভাগের গল্প', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০০

১০। চৌধুরী তহমিনা, চট্টোপাধ্যায় অসীম (সম্পাদনা), 'দাঙ্গা ও সম্প্রীতির গল্প', দীপায়ন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৫

১১। দেবী জ্যোতির্ময়ী, রচনা সংকলন ৩, দে'জ, কলকাতা, ১৯৮৪

১২। বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, একাদশ অখণ্ড সংস্করণ মার্চ ২০১১

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র, 'বাস্তুভিটা', পুস্তকালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৪

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত), 'জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র', গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, ঢাকা, ২১শে বইমেলা ২০০০ উপলক্ষে

১৫। বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দ্র (সম্পাদনা), 'ভেদ বিভেদ', প্রথম খণ্ড, দে'জ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০০৪

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দ্র (সম্পাদনা), 'ভেদ বিভেদ', দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৭

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, মানিক গ্রন্থাবলী, অষ্টম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৪

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, মানিক গ্রন্থাবলী ১২, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫

১৯। বসু বিষ্ণু, মিত্র অশোককুমার (সংকলন ও সম্পাদনা), 'সম্পর্ক সম্প্রীতি-বিষয়ক গল্প সংকলন', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬

২০। ভট্টাচার্য শ্রী দীনেশচন্দ্র, 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, একবিংশতিতম মুদ্রণ মে ১৯৯৭

২১। মজুমদার অমিয়ভূষণ, 'নির্বাস', অমিয়ভূষণ মজুমদারের রচনাসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সংস্করণ ২০০৫

২২। মুখোপাধ্যায় অশোক, 'সংসদ বানান অভিধান' পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩

২৩। রায় দেবেশ (সম্পাদক), 'জীবনানন্দ সমগ্র' প্রথম খণ্ড, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৮৫

২৪। রায় দেবেশ (সংকলন ও সম্পাদনা), 'রক্তমণির হারে', দেশভাগ-স্বাধীনতার গল্প সংকলন, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১

২৫। রায় দেবেশ (সংকলন ও সম্পাদনা), 'রক্তমণির হারে', দেশভাগ-স্বাধীনতার গল্প সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৫

২৬। সান্যাল প্রবোধকুমার, 'হাসুবানু', সাহিত্য-সংস্থা, কলকাতা, সংস্করণ ১৯৮৭

২৭। সৃষ্টি সম্পাদনা পর্ষৎ (সম্পাদনা), 'রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত', সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০১

২৮। সেন সলিল, নতুন ইহুদী, ড. স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ আগস্ট ২০০২

২৯। হুসেন আখতার (সম্পাদিত), 'দুই বাংলার মুক্তিযুদ্ধের কবিতা', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১৬/ ফেব্রুয়ারি ২০১০

গৌণ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। আখতার সানজিদা, 'বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ (১৯৪৭-১৯৭০)' বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৯ / জুন ২০০২

২। ইসলাম নজরুল, ‘বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

৩। ওমর বদরুদ্দীন, ‘ধর্ম রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা’, চিরায়ত, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

৪। কুণ্ডু ড. চন্দনকুমার, ‘ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ, বাংলা উপন্যাসের দর্পণে’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, বড়দিন ২০১৬

৫। খাতুন আসরফী, ‘বাংলা কথাসাহিত্য, চল্লিশের সময় ও সমাজ’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা, কলকাতা বইমেলা ২০১৪

৬। গোস্বামী অর্জুন, ‘দেশভাগের প্রেক্ষাপটে গান্ধী-জিন্না পত্রালাপ’, চয়নিকা, কলকাতা, প্রকাশ ২০০৫

৭। গোস্বামী ড. সনাতন, ‘বাংলা একাঙ্ক নাটক রূপ ও রূপকার’, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, নব সংস্করণ : জুলাই ২০০৩

৮। ঘোষ ড. অজিতকুমার ‘নাটক ও নাট্যকার’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০০/ বৈশাখ ১৪০৭

৯। ঘোষ ড. অজিতকুমার, ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’, দে’জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৪/ আশ্বিন ১৪২১

১০। ঘোষ ড. জগন্নাথ, ‘রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস’, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১৫

১১। ঘোষ তপোব্রত, ‘রবীন্দ্র- ছোটগল্পের শিল্পরূপ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ: আগস্ট ২০০৩

১২। ঘোষ নিত্যপ্রিয়, ‘কিছু যন্ত্রণা কিছু কৌতুক’ গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭

১৩। ঘোষ নীরেন, ‘দেশভাগ ও নানা প্রসঙ্গ’, নিশান প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯০

১৪। ঘোষ বুদ্ধদেব, বিশ্বাস দেবব্রত (সম্পাদনা), ‘সাতচল্লিশের দেশভাগ’, ব্যঞ্জনবর্ণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬

১৫। ঘোষ সেমন্তী (সম্পাদনা), ‘দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা’, গাঙচিল, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৪

১৬। ঘোষাল পৌলমী (সম্পাদনা) ‘ধ্বংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ’, সেরিবান, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

১৭। চক্রবর্তী প্রফুল্লকুমার, ‘প্রান্তিক মানব, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা’, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫

১৮। চক্রবর্তী বিকাশ, 'আন্দামানে পুনর্বাসন এক বাঙাল অফিসারের ডায়েরি', গাঙচিল কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২
১৯। চক্রবর্তী বিকাশ, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭
২০। চক্রবর্তী সৌমেন, 'উদ্বাস্তু জীবন ও মানবাধিকার', মুক্তমন, কলকাতা, কলকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারি ২০১৩
২১। চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম, 'জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি ১৯০৫- ৪৭', বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, আগস্ট ২০১৬
২২। চট্টোপাধ্যায় ভবানীপ্রসাদ, 'দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনি', আনন্দ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৩
২৩। চন্দ্র ড. দীপক ,'বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা', সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, জন্মাষ্টমী ১৯৮২
২৪। চন্দ্র বিপান, 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা', কে পি বাগচী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯
২৫। চ্যাটার্জী জয়া, 'দেশভাগের অর্জন, বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭' (আবু জাফর অনূদিত) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
২৬। চ্যাটার্জী জয়া, 'বাংলা ভাগ হল, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭' (অনুবাদ: আবু জাফর), এল্ অ্যালমা পাবলিকেশনস, কলকাতা, প্রথম বাংলা সংস্করণ ২০০৩
২৭। দত্ত কল্যাণী, 'ছিটমহল', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৭
২৮। দাশ উদয়চাঁদ, 'ছোটগল্পের বর্ণালি, কথা থেকে শৈলী', রত্নাবলী, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৭, আশ্বিন ১৪১৪
২৯। দাশ উদয়চাঁদ (সংকলন ও সম্পাদনা), 'দেশবিভাগ ও বাংলা আখ্যান', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, মে ২০১৬
৩০। দাশগুপ্ত আনন্দ (সম্পাদনা),'স্বাধীনতা স্বদেশ সমাজ সংস্কৃতি', গাঙচিল, কলকাতা, বইমেলা ২০০৮
৩১। পাল ড. নারায়ণ, 'দেশভাগের বলি-বাঙালি', দ্বিতীয় খণ্ড-কৈশোর, প্রয়াস পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স, কলকাতা, কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০১১
৩২। পাল মধুময় (সম্পাদনা), 'দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ', গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১

৩৩। পাল মধুময় (সম্পাদিত), ‘মরিচঝাঁপি ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস’, গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯
৩৪। পাল মধুময় (সম্পাদিত), ‘মরিচঝাঁপি নিজের কথায়’, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১
৩৫। প্রধান অভীক (সম্পাদনা), ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য নানা বিষয়, নানা ভাবনায়’, শ্রীলিপি, মেদিনীপুর, জুন ২০১৮
৩৬। বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর, ‘পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস’, আনুবাদ: কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৬
৩৭। বন্দোপাধ্যায় শৈলেশকুমার, ‘দাঙ্গার ইতিহাস’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২
৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, ‘ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা’, রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, তৃতীয় সংশোধিত ও পরিমার্জিত প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫
৩৯। বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, ‘দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা’, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০১
৪০। বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, ‘ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা’, উৎস মানুষ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯২
৪১। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১২/ মাঘ ১৪১৮
৪২। বন্দ্যোপাধ্যায় সুজাতা, ‘দেশভাগ ও বাংলা সাহিত্য বর্তমান-প্রেক্ষিতে’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, মহালয়া ২০১৫
৪৩। বসু অর্পিতা (ভূমিকা ও সম্পাদনা), ‘উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পুনর্বসিত, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়’, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩
৪৪। বসু গৌতম, ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস’, বি. বি. কুন্ডু গ্র্যান্ডসন্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ, ২০০৯
৪৫। বসু জ্যোতির্ময়, ‘সাতচল্লিশের দেশভাগ’, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
৪৬। বসু ঝর্ণা (সম্পাদনা), ‘দেশভাগ সাহিত্য: বিপন্নকালের ভেলা’, গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৫
৪৭। বিশ্বাস অধীর (সম্পাদক), ‘বর্ডার, বাংলা ভাগের দেওয়াল’, গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬
৪৮। বিশ্বাস অধীর, ‘উদ্বাস্তু–পঞ্জিকা’, দেশভাগ: তৃতীয় পর্ব, গাঙচিল, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪

৪৯। বিশ্বাস উত্তমকুমার, 'দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক, দৃশ্যত জীবন', বাঙলার মুখ, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

৫০। বিশ্বাস সুকৃতিরঞ্জন, 'প্রসঙ্গ দলিত মুক্তি আন্দোলন', চতুর্থ দুনিয়া প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭

৫১। বোস চঞ্চল কুমার, 'বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ', বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা, চৈত্র ১৪১৫ / এপ্রিল ২০০৯

৫২। ভট্টাচার্য তাপস, 'বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২৫শে বৈশাখ ১৪১১

৫৩। মণ্ডল নিরুপম রায় (সম্পাদনা), 'ধ্বংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ', সেরিবান, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

৫৪। মণ্ডল মননকুমার (সম্পাদক), 'পার্টিশানের সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি', গাঙচিল, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৪

৫৫। মিত্র ড. সরোজ মোহন (সম্পাদনা), 'স্বাধীনতা প্রাক্ ও উত্তরের বাংলা ছোটোগল্প বিচিত্রা মননে ও বিশ্লেষণে', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১৪

৫৬। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা', বাংলা ছোটগল্পের একশ' দশ বছর: ১৮৯১ -২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ মাঘ ১৪১৬/ জানুয়ারি ২০১০

৫৭। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, 'কালের প্রতিমা', বাংলা উপন্যাসের পচাঁত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৭/ এপ্রিল ২০১০

৫৮। মুখোপাধ্যায় শৈলেশকুমার, 'দাঙ্গার ইতিহাস', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

৫৯। মুখোপাধ্যায় সঞ্জয়, 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান প্রস্তুতি ও পরিণতি ১৯৪৫-৪৭', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১২

৬০। রায় রণজিৎ, 'ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ', কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১০

৬১। রায় রাহুল (সম্পাদনা) 'পশ্চিম থেকে পূর্ব বঙ্গ: দেশ বদলের স্মৃতি', গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫

৬২। সরকার সুমিত, 'আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭', কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৩

৬৩। সাহা পঞ্চানন, 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক: নতুন ভাবনা', বিশ্ববীক্ষা, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৭

৬৪। সিনহা ড. হেনা, ‘বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ, ভগ্ননীড়ের বেদনা’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, স্বাধীনতা দিবস ২০১০
৬৫। সিংহ কঙ্কর, ‘সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট’, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৬৬। সিংহ তুষার, ‘মরণজয়ী সংগ্রামে বাস্তুহারা’, দাস গুপ্ত’জ, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯৯
৬৭। হীরা আশিস, ‘ উদ্বাস্তু ইতিহাসে ও আখ্যানে’, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯
৬৮। Chatterjee Joya, Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition 1932-1947, Cambridge University Press, Cambridge, 1994
৬৯। Das Suranjan, Communal Riots in Bengal 1905-1947, Oxford University Press, Delhi, 1991

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১। আচার্য অনিল (সম্পাদক), ‘অনুষ্টুপ’ সাহিত্য ও সংস্কৃতি- বিষয়ক ত্রৈমাসিক, কলকাতা, চতুর্থ সংখ্যা ১৯৯৬
২। ঘোষ অভ্র, দত্ত মিলন, ঘোষ তপস্যা (সম্পাদনা), ‘বিতর্কিকা’, গ্রন্থসমালোচনার পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংখ্যা নব পর্যায় আশ্বিন ১৪২০/ অক্টোবর ২০১৩
৩। চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত, ‘পরিকথা’, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, দে’জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২৫, মে ২০১৮
৪। চাঁড়াল কল্যাণী ঠাকুর (সম্পাদক), ‘উদ্বাস্তু নীড়’, প্রকাশক ‘নীড়’ পত্রিকার পক্ষে কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, ২০০৯
৫। বিশ্বাস অধীর (সম্পাদক), ‘শরণার্থী’, গাঙচিল পত্রিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক সূচনাসংখ্যা, গাঙচিল, কলকাতা, জুলাই ২০১৭
৬। বেরা ড. মদনমোহন (সম্পাদক), ‘এবং মহুয়া’, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা, ২০ তম বর্ষ, ১১১সংখ্যা, কে. কে. প্রকাশন, মেদিনীপুর, ডিসেম্বর ২০১৮
৭। ভৌমিক তাপস (সম্পাদক), ‘দুই বাংলার কবি ও কবিতা’, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয় ২০১৫
৮। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ৩১ জানুয়ারি ২০১৮, বুধবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: ১১ দেশের শরণার্থী নিষেধাজ্ঞা তুলল ওয়াশিংটন)
৯। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, বৃহস্পতিবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: শরণার্থীর রাজধানী হাতে দেব না: কেন্দ্র)

১০। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ (প্রবন্ধ শিরোনাম: উদ্বাস্তু রাজধানী, পৃ: ৪)

১১। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ৫ মার্চ ২০১৮, সোমবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: দেশভাগে দায়ী নন জিন্না, দাবি ফারুকের)

১২। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ১৪ মার্চ ২০১৮, বুধবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: সীমান্ত টপকে রোহিঙ্গার ঢল, পৃ: ১ ও ৬)

১৩। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ১৩ এপ্রিল ২০১৮, শুক্রবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: সীমান্তে 'স্মার্ট ফেন্স', পৃ: ৮)

১৪। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ২৮ এপ্রিল ২০১৮, শনিবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: পাহাড়ে রোহিঙ্গা? সতর্কবার্তা গুরুদের, পৃ: ৩)

১৫। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ২৬ মে ২০১৮ (প্রবন্ধ শিরোনাম: রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ নিয়ে হুশিয়ারি কেন্দ্রের)

১৬। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ২৬ মে ২০১৮, শনিবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: ৪ বাংলাদেশি ধৃত বাদুড়িয়ায়)

১৭। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ২ জুন ২০১৮, শনিবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: শরণার্থী জীবনে রং আনেন জোয়েল)

১৮। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ৯ জুন ২০১৮, শনিবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: রোহিঙ্গাদের ফেরাতে, পৃ: ৯)

১৯। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ৯ জুন ২০১৮, শনিবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: সিরিয়ায় হত ৪৪)

২০। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ২৩ জুন ২০১৮, শনিবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: বিচ্ছিন্নদের মেলাতে উদ্যোগী দুই কোরিয়া)

২১। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ১৫ জুন ২০১৮, শুক্রবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: সীমান্তেই বাবা, মাকে হারাচ্ছে অসংখ্য কচি মুখ, পৃ: ৯)

২২। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ২৩ জুন ২০১৮, শনিবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন বহু শিশুও, পৃ: ৮)

২৩। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ২৮ জুন ২০১৮, বৃহস্পতিবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: মরুপ্রান্তরে ঘুরে মরছেন হাজার হাজার শরণার্থী, পৃ: ৭)

২৪। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ৩ জুলাই ২০১৮, মঙ্গলবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: বিচারপতির সামনে একা, শরণার্থীর বয়স মাত্র চার)

২৫। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ৩ আগস্ট ২০১৮, শুক্রবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: দুর্ভাবনা কমছে কই)

২৬। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ৮ আগস্ট ২০১৮, বুধবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: ভারতও কি সিরিয়া হবে)

২৭। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বুধবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: রোহিঙ্গ সংকটে বিপুল সাহায্য আমেরিকার)

২৮। মজুমদার অভিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, দৈনিক, ১ অক্টোবর ২০১৮, সোমবার (প্রবন্ধ শিরোনাম: সপরিবার কেরল যাচ্ছেন রোহিঙ্গারা, সতর্ক পুলিশ, পৃ: ৭)

২৯। হাসান জাহিরুল, 'বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর', দে বুক স্টোর, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১৫